দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 JUL 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

ঢাকা ঃ রোববার, ৯ শ্রাবণ, ১৩৯৪

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা ঃ বাস্তবতার আলোকে

আবদুল মতিন চৌধুরী

দেশের প্রাথমিক শিক্ষা হলো তার মেরুদণ্ড। শিক্ষার কয়েকটি স্তর আছে। যেমন প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। শিশুরা হলো আগামী দিনের কর্ণধার। আজকের শিশুই বড় হয়ে একদিন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভাব গ্রহণ করবে, এটা চিরন্তন সত্য। এ সত্যের আলোকে চিন্তা করলে দেখা যায়, যদি শিশুকে উন্নতমানের শিক্ষা দিয়ে উপযুক্তভাবে গঠন করা না হয় তবে শিক্ষার পরবর্তী পর্যায়ে তারা হবে ব্যর্থ আর সে ব্যর্থতা জন্ম দিয়ে থাকে নানারূপ জটিল সমস্যার।

বাংলা দেশের মত উন্নয়নশীল দেশে আজকের যত সমস্যা তার সবগুলোর উৎপত্তি স্থল হলো প্রাথমিক শিক্ষার স্তর। তাই স্বাধীনতার সতেরো বছর পরও দেখা যায় আমাদের সমস্যা দূরীভূত না হয়ে বরং শাখা প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে আমাদের গোটা জাতিকে অবক্ষয়ের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আমাদের সরকার তথা বুদ্ধিজীবী মহলের নতুন করে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন।

আমি এখানে সিলেট জিলার বিয়ানী বাজার উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বাস্তব চিত্র তুলে ধরছি। বাংলাদেশের ৪৬০টি উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা মোটামুটি একইরূপ। একমাত্র কতিপয় শহর বন্দর এর থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম।

বিয়ানী বাজারে মোট ১১৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চল্লিশ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। এত বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক মাত্র ৩৯৮ জন। অর্থাৎ গড়ে ১০৭ জন শিক্ষার্থীর ভাগ্যে একজন শিক্ষক শিক্ষাদানে রত আছেন।

উপজেলা সদরে অবস্থিত বিয়ানীবাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৮১ জন। শিক্ষকের সংখ্যা ১০ জন। উপজেলার সবচেয়ে ভাগ্যবান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটা। কারণ, স্কুলটি কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় অবস্থিত। এটা একটিমাত্র ভাগ্যবান স্কুলের ইতিহাস।

তার পর দেখা যায় দ্বিতীয় পর্যায়ে মাত্র ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭ জন করে শিক্ষক আছেন। সেগুলো হচ্ছে সারপার শিক্ষার্থী সংখ্যা ৬০৬ জন, কেন্দ্র মাথিউরা ৫৭৬ জন, নিদনপুর-সুপাতলা ৪৯৫ জন, গোবিন্দ শ্রী ৩৯৬ জন, কুড়ারবাজার ৩৩৫ জন।

একজন শিক্ষকবিশিষ্ট স্কুল ২টি। ফাজিলপুর বালিকা বিদ্যালয়ে ১০২ জন, আরদাসুরা বালিকা বিদ্যালয়ে ৫২ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করে থাকে। দুই জন শিক্ষকবিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় হলো মোট ৩৯টি। এদের গড় শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৩৫ জন। তিন জন শিক্ষকবিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৫টি আর অন্যান্য ৩৩টি। এদের গড় শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪০০-এর মতো।

একটু চিন্তা করে দেখা যাক পরিস্থিতির ভয়াবহতা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা হাতে খড়ি নিতে আসে তাদের বয়স ৭ বছরের অধিক নয়। এ সময় শিশুরা থাকে দুষ্টুমিপ্রিয় উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। শতাধিক এ ধরনের শিক্ষার্থীকে সংযত রাখতেই একজন শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর অবস্থা নাজেহাল হয়ে যায়। এর পর আর শিক্ষাদানের সময় ও মানসিকতা কোথায়? যাদের অভিভাবক কিছুটা শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত তারা নিজেদের সন্তানের শিক্ষার প্রতি বাড়ীতে কিছুটা নজর রাখেন। কিন্তু এ ধরনের পিতা-মাতার সংখ্যা নগণ্য। ফলে, প্রতি বছর আমাদের অসংখ্য শিশু এমনিভাবে অবজ্ঞা আর অবহেলায় উচ্চ শিক্ষা হতে দূরে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। কেননা, যে বয়সে প্রাথমিক স্তরে সে শিক্ষা লাভ করে তা দিয়ে উচ্চ শ্রেণীর পাঠ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। আমাদের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বিমুখতা ও নকলের প্রতি ব্যাপকহারে ধাবিত হবার এটাই মুখ্য কারণ।

দেখা যায় যে, কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে ১ম ও ২য় শ্রেণীতে শতাধিক শিক্ষার্থী সে স্কুলেই চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে মাত্র ২০/২৫ জন অবশিষ্ট থাকে। এর কারণ কি? তার একটি মাত্র কারণ হলো প্রথম দিকে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করতে না পারার পরিণতি।

উন্নত বিশ্বে দেখা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি ২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক নিয়োজিত। এই হারে চিন্তা করলে আমাদের কম করেও একটি উপজেলায় দু'হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন অর্থাৎ সমগ্র দেশের জন্য মোট প্রয়োজন ৯ লাখ শিক্ষকের। এর মধ্যে বড়জোর আছেন দেড় লাখ। বাংলাদেশের মতো একটা গরীব দেশের পক্ষে এত শিক্ষক আশা করা যায় না। কিন্তু প্রতি ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগ বাস্তবধর্মী। পাকিস্তান আমলেও এ অনুপাত মেনে চলা হয়েছে।

যে দেশে বর্তমানে বহু উচ্চাভিলাষী প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, সে দেশের ভবিষ্যত নাগরিকদের সুশিক্ষার জন্য অনুরূপ শিক্ষক নিয়োগ অবাস্তব নয় বরং সব দিক দিয়েই যুক্তি যুক্ত।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষা লাভের পরিবেশ না থাকার ফলে আজ দেশের আনাচে কানাচে ভিন্ন ভাবধারা ও অপসংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে দেখা দিচ্ছে কিণ্ডার গার্টেন ও আন্তর্জাতিক মানের বিদ্যালয়সমূহ। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের গোটা জাতীয় চেতনার মূলে কুঠারাঘাত হানছে। অত্যধিক ব্যয়বহুল এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র শিক্ষার উন্নত মানের জন্য অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে তাদের শিশুদের পাঠাচ্ছে। এগুলো ক্রমে রাজধানী, জেলা সদর, উপজেলা সদর ছাড়িয়ে গ্রামে-গঞ্জে প্রসার লাভ করছে। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এমন এক ভাবধারায় গঠিত হচ্ছে যাদের মধ্যে বাঙ্গালী চেতনার নামগন্ধও খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে তারা এখন থেকে অবজ্ঞা ও অবহেলার চোখে দেখার মানসিকতায় গঠিত হচ্ছে। এটা জাতির জন্য মোটেই সুখকর নয়।

দেশ স্বাধীন হবার পর জ্যামিতিক হারে ছাত্র শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু শিক্ষকের পদ মোটেই বৃদ্ধি করা হয়নি। বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা ও জটিলতায় বরং অনেক পদ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সেই পাকিস্তান আমলের পদ রক্ষাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। সে সময় অবশ্য অনুপাত ছিল প্রতি চল্লিশ জনে একজন শিক্ষক। আজকে আমাদের সেই পাকিস্তান আমলে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। নতুবা আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের এক বিরাট অংশ অশিক্ষা আর কুশিক্ষায় গঠিত হবার ফলে নানারূপ জটিল জাতীয় সমস্যা সৃষ্টির সূতিকাগারে পরিণত হবে। এর থেকে আমাদের অবশ্যই মুক্তি পেতে হবে এবং প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টার। বর্তমানে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন। স্কুল গৃহের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা হচ্ছে। শিক্ষা উপকরণেরও অনেক উন্নতি হয়েছে। শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু এত করেও আমরা কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ব্যর্থ হচ্ছি। তার একমাত্র কারণ শিক্ষকের পদ বৃদ্ধি না করা। এই মুহূর্তে প্রয়োজন গোটা দেশে কম করেও এক লাখ শিক্ষকের পদ বৃদ্ধি করা। এতে দেশের বেকার সমস্যারও অনেকাংশে সুরাহা হবে। শিক্ষার মান উন্নয়নেও যথেষ্ট অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। এ বিষয়ে সরকারের আশু দৃষ্টিপাত প্রয়োজন।